একক ৬ ❐ মেঘনাদবধ কাব্য (১ম, ৪র্থ, নবম সর্গ)

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য
৬.১ প্রস্তাবনা
৬.২ সারাংশ ও আলোচনা
৬.৩ প্রথম সর্গ
    ৬.৩.১ রস বিচার
    ৬.৩.২ রাবণ চরিত্র
    ৬.৩.৩ মহাকাব্যের লক্ষণ
৬.৪ চতুর্থ সর্গ
    ৬.৪.১ সীতা চরিত্র
৬.৫ নবম সর্গ
    ৬.৫.১ প্রমিলার বিষাদিনী মূর্তি
    ৬.৫.২ রাবণ
৬.৬ অনুশীলনী
৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাঙালির চেতনায় এক বিস্তার ঘটে। ফলে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল ঘটে। এ যুগের নাম দাঁড়ায় 'আধুনিক যুগ'। এই আধুনিকতা শুধু সাহিত্যের ভাব-পরিবর্তনে নয়, রূপ পরিবর্তনেও। মধ্যযুগের বর্ণনাত্মক (narative) আখ্যানকাব্য এযুগে নাটকীয় (dramatic) মহাকাব্যে রূপান্তরিত হল। দৈবমহিমা গৌণ হয়ে মুখ্য হল মানবমহিমা। পয়ার ভেঙে দাঁড়াল অমিত্রাক্ষরে। শতাব্দীর শুরুতেই এ শব্দের লক্ষণ ফুটে ওঠেনি। ইংরেজি শিক্ষাকে আত্মস্থ করে এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। পুরাতনকে লোপ করে নয়, তাকে আত্তীকরণ করে নবরূপ দেবার এক দুর্নিবার প্রচেষ্টা দেখা দিল এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তা একক ভাবে করে দেখালেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনিই বাংলা সাহিত্যে একক ও অদ্বিতীয় ক্ল্যাসিক কবি। মেঘনাদ বধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম ও শেষ মহাকাব্য।

৬.১ প্রস্তাবনা

মধুসূদন দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও কবি প্রতিভা

কপোতাক্ষ নদের তীরে যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের (মতান্তরে ১৮২৩) ২৫শে জানুয়ারি শনিবারে এক সঙ্গতিপন্ন পরিবারে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রাজনারায়ণ

দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই তাঁর চরিত্রে দুটি গুণ আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহল—অধ্যয়নস্পৃহা ও কাব্যপ্রীতি। লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী, অনলস ভাবে বিদ্যা শিক্ষা করতে পারতেন। শৈশবে তিনি তাঁর মায়ের কাছে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনতেন। এই রামায়ণ, মহাভারত ছিল তাঁর কবিজীবনের ভিত্তি স্বরূপ। পরবর্তীকালে এই দুটি অমূল্য গ্রন্থই তাঁর কবিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করে।

গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ করে মধুসূদন নয় বৎসর বয়সে কলকাতায় হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে সর্বনিম্ন শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখানেই তিনি মহাধ্যায়ীরূপে বাংলার অন্যতম মনস্বী ভূদেহ মুখোপাধ্যায়কে পান। জুনিয়র স্কুলের পাঠ শেষ করে মধুসূদন ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হন। তিনি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সেই সময় স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি হিন্দু কলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়াবার সময় তিনি বহু ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। এই সময়েই তাঁর কবিত্বশক্তির উন্মেষ ঘটে। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন এবং তাঁর রিচত কোনো কোনো ইংরেজি কবিতা বিলেতের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান। হিন্দু কলেজে পড়বার সময় দু'জন ইংরেজ অধ্যাপকের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। তাঁরা হলেন ডিরোজিও ও রিচার্ডসন। মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র না হলেও, ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁর জীবনে কার্যকরী হয়েছিল। রিচার্ডসন ছিলেন কবির কল্পনা-জগতের পথপ্রদর্শক। এই রিচার্ডসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মধুসূদন কলেজে অধ্যয়নকালে কেবল ইংরেজিতেই কবিতা রচনা করতে থাকেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন বিজাতীয় ভাব ও আদর্শে আত্মহারা হয়ে পড়েন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠকবি হোমর, ভার্জিল, তাসো, মিলটনের সমপর্যায়ভুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা এই সময় থেকেই তিনি পোষণ করতে থাকেন। বিলেত যাবার আকাঙ্ক্ষাও তাকে পেয়ে বসে। আর তাই তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই তাঁর মাতা-পিতা, সাংসারিক সুখসম্পদ সমস্ত কিছুকে জন্মের মতো বিসর্জন দিয়ে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৩ সালে। খ্রিস্টান হবার পর তাঁর নাম হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় মধুসূদনের হিন্দুকলেজে আর স্থান হল না, এমনকী হিন্দু সমাজেও নয়। তাই বাধ্য হয়ে তিনি বিশপস্ কলেজে ভর্তি হলেন। এই ধর্মান্তর গ্রহণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বিপর্যয়ের কারণ হলেও এরই মধ্যে ঘটে তাঁর কবিজীবনের বৃহত্তর বিকাশের দ্বারোদঘাটন।

হিন্দুকলেজের মতো বিশপস্ কলেজও তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠন করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। বিশপস্ কলেজ হয় তাঁর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্র। এখানে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করবারও সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু খুব বেশিদিন এখানে পড়াশোনা করা সম্ভব হল না, কারণ তাঁর পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিলেন। এরপর একদিন তিনি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কাউকে কিছু না বলে মাদ্রাজে চলে গেলেন। এই স্থানে এসে তিনি এক অনাথবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদে যোগ দেন। ক্রমে তিনি মাদ্রাজ প্রেসেডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও মাদ্রাজের তদানীন্তন বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'Spectator'-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এখানকার প্রবাস জীবন দারুণ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে পূর্ণ তাঁর। দারিদ্র্যমোচনের জন্য এবং দারিদ্র্যদুঃখ ও নৈরাশ্য বিস্মৃত হবার জন্য তিনি মাদ্রাজে থাকতেই সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানকার নানান ইংরাজি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন তিনি এই সময়। 'Captive Lady', 'Visions of the Past' এই সময়েরই রচনা। তাঁর 'Captive Lady' মাদ্রাজে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় এটি তেমন আদৃত হয়নি। তাঁর অনুরাগী বন্ধুরা মধুসূদনকে বারবার মাতৃভাষা চর্চা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। অতঃপর তিনি বাংলা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে কলকাতায় ফিরে এলেন।

মধুসূদন ছিলেন প্রধানত কবি, বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁর প্রথম দান 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য'। কিন্তু তাঁর প্রতিভার উন্মেষ হয় নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' (১৮৫৮)। ১৮৫৯ সালে 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০)। গ্রীক পুরাণের কাহিনিকে আশ্রয় করে তিনি সাহসের পরিচয় দিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে তিনি দুটি প্রহসনও রচনা করেন। 'পদ্মাবতী'-র পর মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নামে একটি বিয়োগান্তক নাটক রচনা করেন। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১।

নাটক রচনার পর সহসা তাঁর কবি প্রতিভার পূর্ণ-জাগরণ ঘটে। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করবার অভিপ্রায়ে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনা করেন সর্বপ্রথম। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও উচ্চাঙ্গের কাব্য 'মেঘনাদবধ' রচনা করেন। বাঙলার শিক্ষিত সমাজ এই কাব্যরচনার জন্য তাঁকে মহাকবি স্বীকৃতি দিলো। এই কাব্যই বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনলো। 'মেঘনাদবধ' রচনার প্রায় সমকালে তিনি 'বীরাঙ্গানা' ও 'ব্রজাঙ্গনা' নামে আরও দু'খানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। এরপর জীবনের অপর বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য তিনি ইংলন্ড যাত্রা করেন। পরে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কিন্তু উদ্দাম অমিতাচার এবং অদূরদর্শিতা ও মহানুভবতার ফলে ঋণজালে জড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শোচনীয় অবস্থায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মধুসূদনের কাব্য গ্রন্থাবলি :

১। 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' (১৮৬০)
২। 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১)
৩। 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)
৪। 'বীরাঙ্গানা' (১৮৬২)
৫। চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

৬.২ সারাংশ ও আলোচনা

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু :

'মেঘনাদবধ' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠকাব্য। উল্লাসে ও হাহাকারে মধুসূদনের কবিপ্রাণ এখানে সর্বাধিক মুক্ত। কবি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কাহিনি রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছেন। বীরবাহুর মৃত্যুর পরে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ কর্তৃক রাক্ষসসেনার সৈন্যপত্য-গ্রহণ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজারত নিরস্ত্র বীর ইন্দ্রজিতের লক্ষ্মণের হাতে মৃত্যুবরণ ; ক্রুদ্ধ রাবণের যুদ্ধযাত্রা এবং শক্তিশেলে লক্ষ্মণের আহত হওয়া, ঔষধাদি আনয়ন করে লক্ষ্মণের জীবনদান, মেঘনাদের মৃতদেহ সৎকার—এই হল মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনি। কাহিনির মূল কাঠামোর মধ্যে নানা ঘটনা বিস্তার ও বর্ণনার সমারোহ আছে। তবে কাহিনি অংশ রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও কবির বিশিষ্ট জীবন-জিজ্ঞাসার স্পর্শে তা নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে উচ্চ শ্রেণির কবি প্রতিভা নিয়েই শুধু হাজির হননি, কবি বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণে রাম যেমন আদর্শের মূর্ত প্রতীক, কৃত্তিবাসে রাম স্বয়ং ভগবানের অবতার ; মধুসূদনের রাম তেমনি নতুন যুগের মানুষের প্রতিনিধি। কৃত্তিবাস কল্পিত বাঙালি সুলভ দুর্লভ রাম চরিত্রই বোধহয় তাঁকে এই চরিত্রটি সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। তাই এতদিন যাঁরা পূজিত ছিল তাঁরাই ধিক্কৃত হলেন, এবং যাঁরা ছিলেন নিন্দিত তথা বর্বর রাক্ষস তারাই মাহাত্ম্য পেল। মধুসূদনের রোমান্টিক মন রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল। তাছাড়া ঊনবিংশ শতকে

জাতীয়তাবোধ বাংলাদেশে যখন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, তখন অবশ্যই পররাজ্য আক্রমণকারী রাম-লক্ষ্মণের তুলনায় রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি দেখা দেয় বলাই বাহুল্য। সর্বোপরি, রাবণের দুর্দম শক্তি, তার নিয়তি লাঞ্ছিত সর্বনাশ কবির আপন অন্তরের সঙ্গে সহজেই মিশে গেছে। রাবণ শুধু রামায়ণের অন্যতম বীরমাত্র নয়, কবি আত্মার প্রতিকলমে সে যেন স্বয়ং মধুসূদন হয়ে উঠেছে কাহিনি, বর্ণনা, চরিত্রসৃষ্টি সব কিছু ছাপিয়ে একটা বিস্ময় বিমূঢ় জিজ্ঞাসা, জীবন সম্পর্কে একটু নতুন বোধ যেন বড় হয়ে উঠেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের পটভূমিকা :

মহাকবি মিলটনের একলব্য শিষ্য ছিলেন মধুসূদন দত্ত। মিল্টন তাঁর কাব্যের কাহিনি সংগ্রহ করেছিলেন বাইবেল থেকে। আর মধুসূদনের কাব্যের উপাদান মিলেছিল রামায়ণে। রাম কাহিনিকে মধুসূদন যুগোপযোগী রূপ দিয়েছিলেন। প্রয়োজনে হোমার, ভার্জিল ও মিলটনের কাছ থেকে নিয়েছিলেন উপাদান। সহায়তা করেছিলেন কালিদাস, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস। ভাস্করের নৈপুণ্যে মধুসূদন মহাকাব্যের মণিহর্ম্যে হীরকখণ্ড বসিয়ে দিয়েছেন দেশ-বিদেশের কাব্য থেকে সংগ্রহ করে। প্রাচ্য কাব্য নাটক প্রভৃতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়, সেই রীতি পরিত্যাগ করে কবি এই কাব্যে প্রথমেই বীণাপাণির বন্দনা গান গেয়েছেন। এতে কবির উপর গ্রীক-কবি হোমার, ইতালির কবি ভার্জিল ও ইংরেজ কবি মিল্টনের প্রভাব স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে। এইভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদকে নতুনভাবে, নতুন সাজে 'মেঘনাদবধ' কাব্যে পরিবেশন করেছেন। তবে এই অনুকরণে কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়নি অথবা কবির মৌলিকতা ও স্পষ্ট হয়নি। রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং রাক্ষসদিগের প্রতি বিরাগ উদ্রেক করাই রামায়ণের কবির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই চিরপুরাতন আদর্শ পরিত্যাগ করে 'মেঘনাদ বধে'র কবি রাক্ষসদিগের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। রাক্ষস-পরিবারের স্বজাতি-প্রেমে মুগ্ধ হতে হয়, তাদের বিপর্যয়ে কাতর হতে হয়। মধূসূদন রাক্ষসকে রাক্ষস করে আঁকেননি, মানুষের মতো দেখেছেন, বীরত্বের মহিমা দান করেছেন। অন্যদিকে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতাদেবী এঁরা কেউ অবতার নন, মানব-মানবী-সাধারণ মানুষের মতো তাঁরা সুখদুঃখভোগী। আপন স্বদেশপ্রীতি তিনি রাক্ষসগণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে তিনি বিদেশি সৈন্য এসে কীভাবে অপরের দেশ আক্রমণ করল তা চিত্রিত করেছেন। সেই আক্রান্ত দেশ তথা লঙ্কার স্বাধীনতা বিপন্ন। এই যুদ্ধে তিনি ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের ছবি হয়তো দেখাতে চেয়েছিলেন। মধুসূদন রাবণ চরিত্রে এক অপ্রতিহত অদম্য শক্তির গতিবেগ লক্ষ করেছেন। আর তাই রাবণ তাঁর কাছে grand fellow, আর রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ তাঁর কাছে 'my favourite Indrojit'. রাবণ আপন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার দেশরক্ষায় অসাধারণ বীরত্ব কবিকে মুগ্ধ করেছে।

'মেঘনাদবধ' কাব্যে নারী চরিত্রগুলি অঙ্কনেও কবি অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন। প্রমীলা বীরাঙ্গনা, কঠিনে-কোমলে বীরাঙ্গনা কবির অসামান্য সৃষ্টি। সরমা রাক্ষস বধূ বিভীষণের পত্নী। রাজপুরীতে সীতার প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি, রাবণের পাপাচরণের প্রতি ঘৃণা তাঁর চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। অন্যদিকে রামের চরিত্রকে অত্যন্ত শান্ত, বিপদে কাতর ও দুর্বলচিত্ত রূপে অঙ্কন করেছেন।

'মেঘনাদ বধ' কাব্য করুণ রস প্রধান। যদিও কবি তাঁর কাব্যের সূচনায় বলেছেন, 'গাইব মা, বীররসে ভাসি মহাগীত' তথাপি কাব্যের শুরু ও শেষ করুণ রসেই, বীররস স্থানে স্থানে উৎসারিত হয়েছে মাত্র। কাব্যের আরম্ভ হয়েছে রাবণের করুণ বিলোপে এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার সহমরণ ও রাবণের মর্মভেদী হাহাকারের সঙ্গে। মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণকালে রাবণের উচ্ছ্বাস, সীতা ও সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস প্রাধান্যলাভ করেছে। এক কথায় বলতে গেলে পরাজয়ের কারুণ্যই সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের গঠনশৈলী বিচার করলে দেখা যাবে কাব্যটি নয়টি সর্গে বিভক্ত। প্রতিটি সর্গের বিষয়বস্তু অনুযায়ী তার পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—

১। প্রথম সর্গের নাম 'অভিষেক'।

২। দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অস্ত্রলাভো'।

৩। তৃতীয় সর্গের নাম 'সমাগমো'।

৪। চতুর্থ সর্গের নাম 'সমাগমো'।

৫। পঞ্চম সর্গের নাম 'উদ্যোগো'।

৬। ষষ্ঠ সর্গের নাম 'বধো'।

৭। সপ্তম সর্গের নাম 'শক্তি নির্ভেদো'।

৮। অষ্টম সর্গের নাম 'প্রেতপুরী'।

৯। নবম সর্গের নাম 'সংস্ক্রিয়া'।

৬.৩ প্রথম সর্গ

এই নয়টি সর্গের মধ্যে প্রধান হল ষষ্ঠ সর্গ, এই সর্গেই রামানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করেছেন। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথম সর্গের নাম 'অভিষেক'। মেঘনাদকে রাবণ সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন। এটি আলোচ্য সর্গের কেন্দ্রীয় ঘটনা। অনেক সমালোচক এই প্রথম সর্গটিকে কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে অভিহিত করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে, বাব্যোৎকর্ষের দিক থেকে প্রথম সর্গটির স্থান অতি উচ্চে। প্রথম সর্গের শুরু হয়েছে একটি নাটকীয় চমক দিয়ে—

'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে.... ।'

বীরবাহুর অকাল মৃত্যুর সংবাদটি মাত্র পাঠকদের দিয়ে কবি ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে পরবর্তী সেনাপতির প্রসঙ্গ তুললেন। তারপর দেবী সরস্বতীবন্দনা, রাবণের রাজসভার বর্ণনা করলেন। এভাবেই তিনি পাঠকদের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে নাট্যরস তৈরি করেছেন। এ ধরণের অসামান্য নাট্যমুহূর্ত এই সর্গে আরও লক্ষ্য করা যায়। রাবণের স্বর্ণসিংহাসনের বর্মনা দিয়েছেন কবি। তারপর ভগ্নদূতের মুখ দিয়ে বীরবাহুর যুদ্ধ ও মৃত্যুর কাহিনি শুনিয়েছেন এইভাবে—

"..... কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত," —এতেক কহি নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত..... ।'

ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে রাবণের চিত্ত-হাহাকারের আবেগ তাড়িত বর্ণনা সর্গের প্রথমেই স্থান পেয়েছে। কিন্তু বীরবাহুর মৃত্যুর বিস্তৃত বর্ণনা শোনবার পর হাহাকারের পরিবর্তে রাবণের কণ্ঠে

উল্লাস বুঝিয়ে দেয় এটি সাধারণ কোনো কাব্য নয়, মহাকাব্য ; আর মহাকাব্যের প্রয়োজনে এখানে বীররসের সঞ্চার ঘটেছে—

'এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; সাবাসি দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহেরে পশিতে
সংগ্রামে ?'

পুত্র বীরবাহু বীরের মতো যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছে—এ তার পক্ষে কম গৌরবের নয়। যে বীর সে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে ভয় পায় না। একদিকে বেদনার হাহাকার, অন্যদিকে বীরত্বের উল্লাস—এ দুয়ের বেনীবন্ধন ঘটেছে রাবণ চরিত্রে। আর এই বীর ও করুণের উৎস থেকে এ কাব্যের রসধারা উৎসারিত হয়েছে।

৬.৩.১ রস বিচার

প্রথম সর্গে বীর ও করুণরসের দুটি সুরই সমানভাবে বেজেছে, মাঝে মেঘনাদ ও প্রমীলার প্রমোদকাননের বর্ণনায় আদিরসের উল্লেখ আছে। এই প্রথম সর্গেই বীর ও করুণ দুটি রসই উৎসারিত হয়েছে। এ দুটি রস সমন্বিত হয়ে তাঁর কাব্য বীণায় যত সুন্দর ও গম্ভীর হয়ে বেজেছে এমন আর কোনোটিই নয়। রাবণের শত্রু হত্যার প্রতিজ্ঞার ভাষায় যেখানে বীরভাব প্রকাশিত সেখানেও ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত হয়েছে কারুণ্য ; আর যেখানে বেদনার্ত প্রকাশিত সেখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে বীরত্বধর্ম। চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাব যে ব্যাখ্যার সৃষ্টি করেছে, সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধসজ্জা সেই ব্যথার মাঝে বীর্যবত্তাকে উৎসারিত করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে সৈন্যদের রণসজ্জা ও পথপরিক্রমার একাধিক চিত্র আছে, যুদ্ধান্তে রণক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষেরও ছবি আছে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধবর্ণনা তেমন একটা নেই। রাবণের আদেশে সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতির বর্ণনা দিয়েছেন কবি এভাবে—

'এতেক কহিলা যদি নিকষা-নন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে।

একটা কোলাহল মুখর প্রজ্জ্বলিত শোভাযাত্রার সামগ্রিক চিত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী, পদাতিক, ধ্বজাবাহী বিভিন্ন সৈন্যদের পরিচয় দিয়েছেন কবি। দুর্গ প্রাকার থেকে রাবণের রণক্ষেত্র প্রদর্শন বর্ণনা-সৌন্দর্যের দিক থেকে প্রথম সর্গটি উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, এই সর্গে রাবণের আবেগের মধ্যেই তার ট্রাজিক সুর ধ্বনিত হয়েছে।

৬.৩.২ রাবণ চরিত্র

অমিত শক্তিধর ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী রাবণ যেন দৈবাহত এক মূর্তিমান পৌরুষ। বীরবাহুর মৃত্যুতে তিনি কেবল কাতর হননি। অনিবার্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছেন। এতবড় একজন বীরের পক্ষে শুধুই শোকে কাতর হওয়া শোভা পায় না—একথা যখন রাবণকে মন্ত্রী সারণ স্মরণ করিয়েদিলেন, তখন লঙ্কেশ্বর রাবণ তাঁর শোকের স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করেননি। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত বীরবাহুকে প্রাচীর থেকে দেখলেন, দেখলেন অবরুদ্ধ লঙ্কাপুরীকে। শত্রুবেষ্টিত লঙ্কাকে দেখে তাঁর মন বিষাদে ভরে উঠল। অতঃপর পুত্রের মৃতদেহ দেখে

তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, বীরের মতো যুদ্ধ করতে গিয়ে বীরবাহুর এই নিহত হওয়া তিনি গৌরব বোধ করছেন। গ্রিসীয় কাব্য থেকে দেশপ্রেমের আদর্শ গ্রহণ করে মধুসূদন রাবণ চরিত্রে যুক্ত করেছেন। পুত্র বীরবাহুর আপন মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে এই অনুভূতি রাবণের হৃদয়ে গৌরব সঞ্চার করেছে। পুত্রশোকে কাতর রাবণের বিলাপের ভিতর দিয়ে জাগতিক দুঃখে কাতর ঈশ্বর বিশ্বাসী এক মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে। মধুসূদন রাবণকে বিরাট বীর করে আঁকতে চেয়েছেন কিন্তু অতি মহৎ করে স্পষ্ট করেননি। জীবনযুদ্ধে বারবার পরাজিত হওয়ায় তিনি দৈবের আধিপত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তথাপি তিনি থেমে থাকার ব্যক্তি নন। তাই পুত্রবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য রাবণ নিজেই যুদ্ধে যাত্রা করবেন ঠিক করলেন। পুত্র মেঘনাদ তাঁকে নিরস্ত করে স্বয়ং যুদ্ধ-যাত্রার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পুত্রের আগ্রহ দেখে তিনি বললেন যে, মেঘনাদ যদি প্রকৃতই যুদ্ধে যাত্রার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করে ইষ্টদেবের আশীর্বাদ পূর্বক যুদ্ধযাত্রা করে। রাবণের একথায় তাঁর দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়। আসলে বাল্মীকির রাবণকে এখানে চিত্রিত করেননি মধুসূদন ; তিনি দোষে-গুণে রক্তমাংসের মানুষ করে এঁকেছেন রাবণকে। তাঁর রাবণ অনাচারী পাপপরায়ণ অধিপতি মাত্র, অথচ তিনি রাক্ষস নন, দেবতার প্রতি তাঁর ভক্তি আছে, আছে নিষ্ঠা। এখানেই মধুসূদনের রাবণের অনন্যতা।

৬.৩.৩ মহাকাব্যের লক্ষণ

'মেঘনাদবধ' কাব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মৌলিক মহাকাব্য। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে মহাকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—"ট্রাজেডির মত মহাকাব্যেরও মূল আখ্যান থাকে একটি, কিন্তু যেহেতু ইহা দৃশ্য কাব্য নহে সেইজন্য ইহার মধ্যে উপাখ্যান থাকে বেশি। ইহার ভাব ও ভাষা হয় ঐশ্বর্যবান এবং রাজসিক গুণবিশিষ্ট, হেক্সামিটার বা তজ্জাতীয় ছন্দে ইহা রচিত হয়। বিষয় ও বর্ণনার গৌরবে মহাকাব্য সমৃদ্ধ হইবে।" সুতরাং এথেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মহাকাব্যে একটা বিশালতা থাকে, বিস্তৃতি ও উদার্য থাকে, যে কারণে অন্য সকল কাব্য থেকে একে পৃথক করা যায়। এই কারণে এতে উপাখ্যানের বাহুল্য থাকে এবং তা সাধারণত অষ্টাধিক সর্গের হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন যে, মহাকাব্যে একটা জাতির ইতিহাস, যুগের ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস, জাতির ঐতিহ্য ধরা পড়ে। রসাত্মক বাক্যের মাধ্যমে একটি যুগকে বিধৃত করে তার সম্পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরার মধ্যেই মহাকাব্যের সার্থকতা। অলঙ্কার শাস্ত্রবর্ণিত নয়টি রসের যে কোনও একটি মহাকাব্যের অঙ্গীরস হতে পারে।

'মেঘনাদবধ' কাব্যখানি শুধু পরিকল্পনায় নয়, চরিত্র সৃষ্টিতেও মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমেই দেব-দেবীর কথা স্মরণ করতে হয়। মধুসূদন তাঁর দেবদেবীদের হোমারের আদর্শে পরিকল্পনা করেছেন। মহাদেবের ওপর কিঞ্চিত 'কুমার সম্ভবে'র প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁর চরিত্র পরিকল্পনার আর একটি বিশেষত্ব হল ঐশ্বর্য। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র অন্তর ও বাইরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। 'মেঘনাদবধে'র প্রতিটি চরিত্র অনুভূতির ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। এই কাব্যে বর্ণনার ওজস্বিতা ও মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। কবির ভাষায় ও বর্ণনায় আমরা এই ওজস্বিতা লক্ষ্য করি। অতি দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ সংস্কৃতে প্রযোজ্য হলেও বাংলায় তা বেমানান ; তাই মধুসূদন সমাসবদ্ধ পদ সংযোজন না করে সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ সমন্বিত গুরুগম্ভীর জাতীয় অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছেন শুধু নয়, ওজোগুণে এই কাব্যকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন। মধুসূদনের উপমা ব্যবহার যেমন হোমারকে স্মরণ করায়, তেমনি তাঁর স্বীকায়তাও প্রমাণ করে। 'Epic Simile' বলতে যা বোঝায় মধুসূদনের কাব্যে তার বহু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। সুতারাং তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্য একখানি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।

৬.৪ চতুর্থ সর্গ

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রানুযায়ী মহাকাব্যের সর্গ সংখ্যা অষ্টাধিক অর্থাৎ মহাকাব্যের প্রধানগুণ বিস্তৃতি বা বিশালতা। প্রতিটি সর্গ মহাকাব্যকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সর্গ সংখ্যা নয়টি। তন্মধ্যে চতুর্থ সর্গের নাম 'অশোকবনং'। অনন্যোপায় হয়ে চতুর্থ সর্গের অবতারণা করা হয়েছে একথা বলা যায় না। আবার কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, কাব্যের ক্ষেত্রে চতুর্থ সর্গের তেমন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তথাপি মধুসূদন-প্রতিভার স্পর্শে চতুর্থ সর্গের কাহিনিটি অত্যন্ত গাঢ়বন্ধ ও সজীব হয়েছে।

৬.৪.১ সীতা চরিত্র

ইন্দ্রজিতের অভিষেকে সমগ্র লঙ্কাপুরী যখন আনন্দে উদ্বেল, তখন কবি অঙ্কন করেছেন পুরীর এক দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থিত শোকাচ্ছন্ন অশোককাননের এক মর্মস্পর্শী চিত্র। বস্তুত প্রথম তিনটি সর্গে বীররসের আধিপত্য চোখে পড়ে। চতুর্থ সর্গে কবি যেন রণক্ষেত্র থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। কাহিনির পটভূমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে অশোক কাননে, যেখানে রয়েছেন বন্দিনী সীতা। মধূসূদন অশোক কাননে সীতাকে বন্দনা করতে গিয়ে ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সীতার উদ্দেশ্যে তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। বাল্মীকির মানসকন্যার প্রতি এযেন মধূসূদনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তিনি জ্ঞাপন করেছেন। বাল্মীকির মানসকন্যার প্রতি এযেন মধূসূদনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তিনি জ্ঞাপন করেছেন অতি কৌশলে। সীতার মুখ দিয়ে রামকাহিনির পূর্বকথা অর্থাৎ সীতা অপহরণ পর্যন্ত কাহিনি তিনি বর্ণনা করেছেন। এখানে সীতাদেবী নিজেকে সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ বলে ধিক্কার দিয়েছেন। আবার সরমার মাধ্যমে সীতার প্রতি শ্রদ্ধা ও রাবণের সমালোচনা করেছেন মধুসূদন। সরমা ও সীতাকে তিনি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিতা করেছেন। আমরা জানি যদিও সীতা মধুসূদনের মানসদুহিতা নন, সে দাবি প্রমীলার, তথাপি সীতা চরিত্রে মধুসূদন প্রেমের যে আদর্শ ও পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তা একান্তই ভারতীয় নারীসুলভ। সীতার আদর্শ প্রমীলার বিপরীত। সীতার প্রেম মৃতুতেই সহনীয় নয়, অথচ আত্মঘাতী। আত্মার তপশ্চরণে, ধ্যানে ও স্বপ্নে, সংযমে ও ধৈর্যে তাঁর বিচ্ছেদ সুসহ বলেই তো তা মহিমময়—'দুঃসহ সুন্দর' নয়। সীতার সেই সাধ্বী প্রেমের পরিচয় অশোককাননে তাঁর বিরহিনী বেশের মধ্যেই পরিস্ফুট। এ প্রেমের বেদনাও যেমন, এর সুখও তেমন। সীতার মুখে আমরা প্রিয় মিলনের যে সুখস্মৃতির কাহিনি শুনতে পাই তা উগ্রমিলনের কাহিনি নয়। সে সুখে উন্মাদনা নেই, কিন্তু প্রাণের পরিতৃপ্তি আছে। সেই পরিতৃপ্তির কাহিনি সীতা শুনিয়েছেন রক্ষোবধূ বিভীষণ পত্নী সরমাকে—

'কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন ; নবতারা বলী
নবনিশাকান্ত—কান্তি।'

কিন্তু সীতা চরিত্রে কবি যে প্রেমের ধ্যান দেখিয়েছেন তা শুধু দাম্পত্য প্রেম নয়, অথবা সেখানেই তার পরিসমাপ্তি নয়। এ প্রেম নরনারীর যুগল হৃদয়ে জন্ম লাভ করে এবং করুণা বা মৈত্রীর মধ্যে তার চরম সার্থকতা সূচিত হয়। সীতা যেন মূর্তিমতী করুণা, আর এই করুণার মূলে আছে তাঁর পতিপ্রেম। সীতার রাবণ কর্তৃক লাঞ্ছিতা হয়েও মহাশত্রুরও দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। সকল দুঃখকে তিনি আপনার দুঃখ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর উপরে পাপাচরণ করে যারা শাস্তি ভোগ করছে তাদের দুঃখ দেখে তিনি প্রকারান্তরে নিজেকে দায়ী করে তুলেছেন। যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু না হলে সীতার উদ্ধার নেই, সেই ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে সরমা যখন তাঁকে বললেন—

'দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী
বিদরে হৃদয়, সাধ্বী স্মরিলে সেকথা
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহ মূলে
পতির উদ্দেশ্যে সতী, পরিপরায়না
যাবে স্বর্গ পূরে আজি।'
তখন সীতা 'করতলে মূর্তিমতী দয়া
সীতারূপে, দুঃখে কাতর সতত
কহিলা সজলে আঁখি সম্ভাষি সখীরে
কুক্ষণে জনম মম।.....
প্রবেশি যে গৃহে হায়, অমঙ্গালারূপী
আমি।'

এই যে মূর্তিমতী দয়া এর মূলে আছে প্রেম। নারীর সকল সাধনাই প্রেমে আরম্ভ, তা পুরুষের সাধনা-রূপ নয়।

'মেঘনাদ বধে' আমরা সীতা দেবীকে দু'বার মাত্র দেখতে পাই—প্রথমবার, মেঘনাদের অভিষেকের পর এবং দ্বিতীয়বার মেঘনাদের মৃত্যুর পর। প্রথমবারের থেকে দ্বিতীয়বারের চিত্র অনেক বেশি উজ্জ্বল। প্রথমবার বিভীষণ-প-ী সরমা, সীতাদেবীর অঙ্গো অলংকার অপহরণের জন্য রাবণের নিন্দা করলে সীতাদেবী রাক্ষসরাজকে সমর্থন করে বলেছেন—

'বৃথাগঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখী,
আপন খুলিয়া আইম ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমারে
বনাশ্রমে।'

আততায়ী শত্রুকে এভাবে নিন্দার হাত থেকে মুক্ত করা সীতাদেবীর চরিত্রের উপযুক্ত বটে। দ্বিতীয়বার সরমা এসে সীতাদেবীকে মেঘনাদের মৃত্যুর ও প্রমীলার চিতারোহণের সংবাদ প্রদান করলেন। বিধাতার অনুগ্রহে তাঁর কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হবার উপক্রম হল দেখে তিনি বিধাতাকে ধন্যবাদ জানালেন কিন্তু সঙ্গো সঙ্গো রক্ষোবংশের দুরবস্থা স্মরণ করে তাঁর হৃদয় বিগলিত হল। তিনি স্বয়ং নিরপরাধিনী, তথাপি বিধাতা তাঁকে কেন রক্ষোবংশের কালরাত্রি স্বরূপিণী করলেন ? তাঁরই জন্য নিরপরাধ মেঘনাদ এবং নিরপরাধিনী সাধ্বী প্রমীলা যে চিতানলে উৎসর্গীকৃত হয়েছেন, একথা চিন্তা করে তাঁর হৃদয় অধীর হয়েছে। তিনি সজল নয়নে সরমাকে বলেছেন—

'কুক্ষণে জমন মম সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই লো সদা,
প্রবেশি যে গৃহে হায়, অমঙ্গালারূপী
আমি। পোড়া-ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।'

অত্যাচারী রাক্ষসবংশের প্রতি এরূপ অনুকম্পা রামায়ণের সীতা চরিত্রে লক্ষিত হয় না, এ মধুসূদনেরই সৃষ্টি, মধুসূদনেরই কল্পিত।

'মেঘনাদবধ' কাব্যে চতুর্থ সর্গটিকে একমাত্র লিরিকের বিশ্রাম বলে গণ্য করা যায়। পঞ্চম সর্গ থেকে যুদ্ধবিগ্রহ পূর্ণ বীররসাত্মক কাব্যধারা আবার আপনবেগে অগ্রসর হয়েছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে ইন্দ্রজিৎকে, যার বর্ণনা ষষ্ঠ সর্গে। সপ্তম সর্গে রাবণের রণক্ষেত্রে যাত্রা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে তার যুদ্ধের বর্ণনা, অষ্টমে নরক বর্ণনা এবং নবম সর্গে ইন্দ্রজিতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। সুতরাং সমগ্র কাহিনি বিশ্লেষণ করলে চতুর্থ সর্গকে মূল কাব্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্যকে যদিও একখানি পূর্ণাঙ্গ বীররসাত্মক কাব্যে পরিণত করতে পারেননি, তথাপি যুদ্ধের আয়োজন এবং বর্ণনাদির মধ্যে বীররসকেই কাব্যে দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠা। সেদিক থেকে দেখলে চতুর্থ সর্গ যেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে ইন্দ্রজিৎ নিধন যদিও কেন্দ্রীয় আখ্যান, তথাপি মধুসূদন চতুর্থ সর্গে যেন সমগ্র রামকাহিনিকে পাঠকদের কাছে নতুন করে তুলে ধরেছেন। নাটকের ক্ষেত্রে একে রীতি হিসাবে ফ্ল্যাশব্যাক (flash back) বা পশ্চাৎ উদ্ভাসন বলা যায়। সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে যেহেতু কাহিনিগত বিস্তার থাকে তাই এই রীতি-প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না কিন্তু মধূসূদন এখানে সেই রীতির ব্যতিক্রম ঘটালেন। বীররসাত্মক মহাকাব্য রচনা করতে অভিলাষী হলেও কবির আপন প্রাণের মধ্যে যে ব্যক্তিজীবনের ক্রন্দনধ্বনি প্রচ্ছন্ন ছিল তাকে তিনি দূরে ঠেলতে পারেন নি। বাঙালি সুলভ সেই গীতিময়তা, আপন প্রাণের না পাওয়ার সেই আর্তহাহাকার মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যটিকে করুণ রসের পরিণতি দান করেছে। যখন সমগ্র লঙ্কাপুরী মৃত্যুশোকে সন্তপ্ত, যখন সেখানে যুদ্ধের প্রচণ্ড নির্ঘোষ ধ্বনিত হচ্ছে, তখন মধুসূদন পাঠককে কিছুটা রিলিফ (relief) দেবার প্রয়োজনে যেন চতুর্থ সর্গের আয়োজন করলেন। সুতরাং চতুর্থ সর্গ সমগ্র 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মধ্যে স্বতন্ত্র মাত্রাযুক্ত হলেও তা যেমন বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ নয়, তেমনি তার প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা উচিত নয়। আবার একথাও সত্য যে চতুর্থ সর্গ যদি রচিত না হত তাহলে আমরা জনম দুখিনী সীতার পরিচয় পেতাম কি ?

৬.৫ নবম সর্গ

'মেঘনাদবধ' কাব্য যে বিষাদময় সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছিল নবম সর্গে এসে তার সমাপ্তি ঘটল। মধুসূদন কাব্যের সূচনায় বীর রসাত্মক কাব্য রচনার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু কাব্যের প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে যে করুণ রসের সঞ্চার হয়েছে, সমগ্র কাব্যে সেই রসেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং নবম সর্গে এসে তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে। সুতরাং বর্ণনীয় বিষয় পাঠশেষে পাঠকের হৃদয়ে যে ভাব স্থায়ী হয়, তদনুসারে যদি গ্রন্থের রস নির্ণয় করতে হয়, তবে 'মেঘনাদবধ'কে করুণ রস প্রধান কাব্য বলেই নির্দেশ করতে হয়। অশোক কাননে উপবিষ্টা মূর্তিমতী বিরহিনী জানকীর এবং শ্মশান শয্যার স্বামীর পদপ্রান্তে উববিষ্টা নববিধবা প্রমীলার অনুপম চিত্র দর্শনে কে বলবে যে মধুসূদন বীররসেরই কবি ? বস্তুত সমগ্র 'মেঘনাদবধ' কাব্যে মধুসূদনের কবি আত্মার হাহাকারই যেন ধ্বনিত হয়েছে।

এক ভয়ঙ্কর রাত্রে রামচন্দ্র, লঙ্কার সমুদ্রকূলস্থিত রণক্ষেত্রে ভ্রাতা লক্ষ্মণের মৃতদেহ কোলে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের সঙ্গে তা প্রভাত হয়েছিল। রামচন্দ্রের শিবির তখন আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ ; রঘুসৈন্যগণের বিজয়নাদ আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সেই আনন্দ কোলাহল সমুদ্র কল্লোলকেও পরাজিত করে মনস্তাপে ভূমি-শয্যায় উপবিষ্ট রাবণের কর্ণেও প্রবেশ করল। মন্ত্রীর মুখে তিনি লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের সংবাদ শ্রবণ করলেন। পুত্রহন্তা শত্রুর পুনর্জীবন লাভ পুত্রশোক অপেক্ষাও অধিক মর্মভেদী ; কিন্তু এই মর্মবিদারী সংবাদে লঙ্কেশ্বর এবারে মূর্ছিত হলেন না। মানুষের সকল আশা যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখন নিরাশাই মানব-হৃদয়ে আশা দান করে ; রাক্ষসরাজ আজ নিরাশায় বুক বেঁধেছেন। স্বয়ং কৃতান্তও যখন তাঁর ভাগ্যক্রমে স্বধর্ম বিস্মৃত হলেন তখন আর আশা কোথায় ? তিনি বুঝলেন, রাক্ষস বংশের গৌরব-রবি সত্যি সত্যিই চির অন্ধকারে আবৃত হলেন। পুত্রের প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্য তিনি মন্ত্রীর দ্বারা রামচন্দ্রের

নিকট সপ্তাহব্যাপী সন্ধি প্রার্থনা করে পাঠালেন। উদারহৃদয় রামচন্দ্র দুর্ভাগ্য পীড়িত শত্রুর প্রার্থনায় অসম্মত হলেন না। মেঘনাদের শেষকৃত্য এবং সাত দিনের জন্য লঙ্কাযুদ্ধের বিরাম আর্য রামায়ণে নেই, ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন তা কল্পনা করেছেন। কিন্তু ভারতললনা পতির পদপ্রান্তে উপবিষ্টা হয়ে কীভাবে হাস্য মুখে চিতানলে জীবন উৎসর্গ করতে পারে, সাধ্বী প্রমীলার চিতারোহণে মধুসূদন তা বর্ণনা করেছেন, যা পাশ্চাত্য কবির পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। এখানেও মধুসূদনের মৌলিক-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬.৫.১ প্রমীলার বিষাদিনী মূর্তি

আমরা, তৃতীয় সর্গে প্রমীলার বীরাঙ্গানা মূর্তি দেখেছি, আর নবম সর্গে দেখলাম বিষাদিনী মূর্তি। শ্মশান শয্যায় উপবিষ্টা নববিধবা বিষাদিনী মূর্তি না দেখলে তৃতীয় সর্গের সেই রণরঙ্গিণী মূর্তির গাম্ভীর্য অনুভব করা সম্ভব হত না। প্রমীলার চিতারোহণের ন্যায় গম্ভীর ও কুরণভাবোদ্দীপক চিত্র বঙ্গ সাহিত্যে আর কোথাও দেখা যায় না। কবির বর্ণনা শুনে সেই কল্পনাসৃষ্ট দৃশ্য যেন প্রকৃতির ঘটনার মতো প্রত্যক্ষবৎ বলে মনে হয়। লঙ্কার সমুদ্রকূলবর্তী শ্মশান, সেই শ্মশানস্থিত অশ্রুনয়না রক্ষোবালাগণ এবং তাঁদের মধ্যে বিষাদমূর্তি প্রমীলাকে যেন আমরা প্রত্যক্ষের ন্যায় দর্শন করি। এই কি সেই প্রমীলা ? বসন্ত সমাগমে মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় যিনি দর্পিত পদভরে রঘুসৈনিকগণকে দলিত করেছিলেন ? প্রমীলার সেই বিদ্যুল্লতীসদৃশী প্রভা আজ কোথায় ! প্রমীলার মুখে আজ কথা নেই, অধরে হাসি নেই, নয়নে জ্যোতি নেই ; প্রমীলার ললাটে সিন্দুর বিন্দু, কণ্ঠে পুষ্পাদাম, করে শদবা চিহ্ন কঙ্কন, প্রমীলা পতির পদতলে উপবিষ্টা—

'.....মৌনব্রতে ব্রতে বিধুমুখী ;
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন, যথা পতি বিরাজেন এবে ;
শুকাইলে তরুরাজ শুকায় রে লতা।'

৬.৫.২ রাবণ

কিন্তু কেবল প্রমীলারই এই পরিবর্তন ঘটেনি, রক্ষোরাজ রাবণেরও ঘটেছে। সেদিন রক্ষোনাথ নবোদিত দিবাকরের ন্যায় স্বর্ণচক্র রথে আরোহন করে লঙ্কার পুরদ্বার থেকে বহির্গত হচ্ছেন, তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে, তুরঙ্গামগণের হ্রেষাধ্বনিতে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ; তাঁর মহিমামণ্ডিত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করে রক্ষোসৈনিকগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করছে।—এ দৃশ্য যেমন সুন্দর, তেমনই বিস্ময়কর ! তাঁর এই রুদ্রতেজ-ভাস্বর মূর্তি দর্শন করে—

'পলাইল রঘুসৈন্য পলায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি উর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী ; কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন
বজ্রঅগ্নি-পূর্ণ, যবে উড়ায় বায়ু পথে
ঘোর নাদে, পশু-পক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে।'

সেদিনের সেই দৃশ্যের পাশে আজ এই শ্মশান ভূমিতে আর এক দৃশ্য—

'বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষকুল রাজা
রাবণ, বিষাদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।'

সৌভাগ্য লক্ষ্মীর সেই প্রিয়তম পুরুষের পক্ষে একদিনে কি এই পরিবর্তন ঘটা সম্ভব ? বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে ! রাক্ষসরাজের এই অবস্থা অনুভব ভিন্ন বোঝানো সম্ভব নয়।

বর্ণনা এবং চিত্ররচনার গুণে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের এই অংশ সর্বোৎকৃষ্ট। সাগর কূলবর্তী শ্মশানে মেঘনাদ ও প্রমীলার পবিত্রদেহ ভস্মীভূত করবার জন্য চন্দন কাঠের চিতা নির্মিত হয়েছিল। আলুলায়িতাকুন্তরা, সাধ্বী প্রমীলা তার অলঙ্কারগুলি একে একে খুলে সখীদিগকে বিতরণ করলেন এবং তারপর পুষ্পশয্যার ন্যায় চিতা শয্যায় আরোহণ করে পতি মেঘনাদের পদতলে উপবিষ্টা হলেন। তার কণ্ঠে পুষ্পমালা এবং কেশপাশে কুসুমদাম—চিতার চতুর্দিক বেষ্টন করে আর এ সকলের মধ্যে ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসরাজ পাষাণ মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান—এ দৃশ্য যেমন গম্ভীর, তেমনি হৃদয়বিদারক ! চিতারোহণের পূর্বে সঙ্গিনীগণের কাছে প্রমীলার বিদায় গ্রহণ এবং পরলোকগত বীরপুত্রকে সম্বোধন করে রাক্ষসরাজের মর্মভেদী বিলাপ পাঠ পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করে। এমন স্বাভাবিক, এমন হৃদয়বিদারক বিলাপ অতি অল্পই চোখে পড়ে। প্রমীলা চিতারোহণের পূর্বে সখীদিগকে সম্বোধন করে বললেন—

'লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা স্থলে
আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে
কহিও পিতার পদে এসব বারতা।'

হতভাগ্য রাক্ষসরাজকে এসকল শোনাবার জন্যই কি বিধাতা এত কিছুর পরেও বাঁচিয়ে রেখেছেন ? রাবণের এই দুঃখের কাছে রামচন্দ্রের শাণিত অস্ত্রের তীক্ষ্ণতাও যেন ম্লান হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করার শক্তি তাঁর ছিল না, আবার আত্মসংযমেও তিনি যেন অক্ষম। ধীরে ধীরে, পুত্র ও পুত্রবধূর চিতার সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলতে লাগলেন—

'ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।'

একথা সত্য যে রাবণ অপরাধী, কিন্তু কবি তাঁর যে প্রায়শ্চিত্ত বর্ণনা করেছেন, তা যেন তাঁর অপরাধের থেকেও বেশি বলে মনে হয়েছে। নবম সর্গের পুত্রশোক-কাতর রাক্ষসরাজকে দেখলে তাঁর অপরাধ বিস্মৃত হয়ে তাঁর প্রতি সহানুভূতি জাগবে পাঠকের। রাক্ষসরাজের অতি বড় শত্রুও এই সর্গে তাঁর দুঃখে অশ্রুপাত না করে পারবে না। শোকজর্জরিত রাক্ষসরাজের ব্যবহারে কবি মানব-হৃদয়ের একটি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। অনেক সময় দেখা যায়, অপরাধ করেও মানুষ তার নিজের অপরাধ বুঝতে পারে না, অথচ বিধাতার ন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত হলে তখন সে ভাবে কি অপরাধে তাকে এই দণ্ড পেতে হচ্ছে ! মেঘনাদের শ্মশান শয্যাতেও সীতাপহারক রাক্ষসরাজের মুখে আমরা শুনতে পাই—

'.....কি পারে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?'

এই আত্মবঞ্চনাই মানব-প্রকৃতির ধর্ম, যা রাবণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু রাবণ আত্মবঞ্চক হলেও ইষ্টদেবে ভক্তিপরায়ণ ; তাই তাঁর মর্মভেদী আর্তনাদে কৈলাসে ভক্তবৎসলের হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল। তিনি মেঘনাদ ও প্রমীলাকে কৈলাসপুরীতে আনার জন্য পুতাশনকে আজ্ঞা দিলেন। ইরম্মদরূপী অগ্নির স্পর্শে সহসা চিতা প্রজ্জ্বলিত হ'ল। স্বদেশ বৎসল, পিতৃ-মাতৃভক্ত বীর মেঘনাদের এবং পতিগতপ্রাণা সাধ্বী প্রমীলার ভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হল। কিন্তু তাঁদের অমর আত্মা দিব্যদেহ গ্রহণ পূর্বক ঊর্ধ্বলোকে প্রস্থান করল। বিস্মিত লঙ্কাবাসীগণ—

'দেখিলা আগ্নেয়রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসবিজয়ী
দিব্যমূর্তি ; বামভাগে প্রমীলা রূপসী
অনন্ত যৌবন-কান্তি শোভে তনুদেশে
চিরসুখ হাসি রাশি মধুর অধরে।'

যেখানে মেঘনাদ ও প্রমীলার দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই স্থানে একটি সুন্দর মঠ নির্মিত হল। চিতাভস্ম সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে এবং দাহ্যস্থান মন্দাকিনীর জলে ধৌত করে—

'করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষঃদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পারে, আর্দ্র অশ্রুনীরে,
বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে ;
সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।'

কবি অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য আরম্ভ করেছিলেন এবং অশ্রুজলের সঙ্গেই তা শেষ করেছেন। বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্ষসরাজের আর্তনাদে যে কাব্যের আরম্ভ, মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতারোহণের সঙ্গেই তার শেষ। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের আদি, মধ্য এবং অন্ত—সমস্তটাই বিষাদপূর্ণ, সেখানে বীররস অপেক্ষা করুণ রসেরই প্রাধান্য।

৬.৬ অনুশীলনী

১। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মহাকাব্যত্ব নির্ণয় করুন।

অথবা 'মেঘনাদবধ' কোন্ শ্রেণির মহাকাব্য ? প্রথম সর্গ অবলম্বনে এই কাব্যের মহাকাব্যেত্ব নির্দেশ করুন।

২। মধুসূদন কাব্যের সূচনায় জানিয়েছেন যে তিনি বীররসের মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন—পাঠ্য সর্গ অবলম্বনে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রস বিচার সম্পর্কে কবির এই মন্তব্য কতখানি গ্রহণযোগ্য।

৩। প্রথম সর্গ অবলম্বণে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রাবণ চরিত্রের পরিচয় দিন।

অথবা মধুসূদনের রাবণ চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায় আলোচনা করুন।

৪। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে চতুর্থ সর্গের প্রয়োজনীয়তা কতখানি—আলোচনা করুন।

অথবা 'সমালোচকগণ মনে করেন 'মেঘনাদবধ' কাব্যের চতুর্থ সর্গ একটি বিচ্ছিন্ন অংশ'—এ সম্পর্কে আপনার মত জানান।

৫। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের চতুর্থ সর্গ অবলম্বনে সীতা চরিত্রের পরিচয় দিন।

অথবা রামায়নের সীতার চরিত্রের সঙ্গে মধুসূদনের সীতা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য দেখান।

৬। নবম সর্গ অবলম্বনে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতারোহণের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা আলোচনা করুন।

অথবা নবম সর্গ অবলম্বনে রাবণের ট্র্যাজেডির পরিচয় দিন।

৭। প্রথম সর্গের সূচনা হয়েছিল বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের চিত্ত-হাহাকারের মধ্য দিয়ে এবং নবম সর্গ শেষ হয়েছে পুত্র মেঘনাদ ও পুত্রবধূ প্রমীলার অন্তোষ্টিক্রিয়ায় রাবণের মর্মভেদী হাহাকারে। আলোচনা করুন।

৮। প্রথম ও নবম সর্গ অবলম্বনে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রস পরিণাম বিচার করুন।

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত— মধুসূদন কবি ও নাট্যকার

২। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প

৩। দীননাথ সান্যাল—মেঘনাদবধ কাব্য

৪। সম্পাদনা মোহিতলাল মজুমদার—মেঘনাদবধ কাব্য

৫। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলা কাব্য